প্রথম অধ্যায়
মনসা-কথার মিথ

বাংলার লৌকিক দেবী মনসা। মনসা নাগমাতা। আবার উর্বরতার প্রতীক হিসেবে মনসাদেবীর পূজা লোকসমাজে আজও প্রচলিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অতিপ্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল কাব্য এই মনসাদেবীর পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বর্তমান অধ্যায়ে মনসা কথার মিথ আলোচনা করতে গিয়ে মিথ সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

মিথ কি করে গড়ে উঠেছে আদিমকালে, সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের অভিমত প্রকাশ করলেও, একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে আদিম মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অনেক দুর্বোধ্য বিষয় এবং ঘটনার অন্তরালে নানা ধরনের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করত। এই সব শক্তির বিবর্তিত রূপই হল দেবতা, যাদের ক্রোধ নিরসন এবং মনতুষ্টির জন্যে বিভিন্ন ধরনের আচার-বিধি পালন করা হত। এরই সূত্রে যেসব গল্প কালক্রমে গড়ে উঠেছে তাই রূপান্তরিত হয়েছে 'মিথ'-এ। এই সমস্ত আদিম ঘটনাগুলি সম্বন্ধে প্রচলিত ভাবনাসমূহ ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে এবং তার উপরে মানুষের চলমান সমাজ ধারার প্রবাহ যে পলি সঞ্চিত করে গেছে সেগুলিই একটা সামগ্রিক মিথীয় ভাবনায় পরিণত হয়েছে।

গ্রিক 'Mythos' থেকে উৎপন্ন 'মিথ' শব্দটি। মিথ-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'পুরাকাহিনী' পাওয়া যায়। 'মিথ' থেকে 'মিথলজি' (Mythology) শব্দ তৈরী হয়েছে। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ভাষায় আঠারো খানা পুরাণ এবং আঠারো খানা উপ-পুরাণ পাওয়া যায়। মিথ বা পুরাকাহিনী পৃথিবীর সব দেশে সব নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। মুখে মুখে রচিত হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা গল্পের আকারে প্রচলিত হয়েছে। পুরাকাহিনী লোকে বিশ্বাস করে এবং তা বিশ্বাসী সংস্কারের মধ্যে মিশে গেছে। সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার উদ্দেশ্যে লৌকিক-অলৌকিক ঘটনাবলী সমন্বয়ে পুরাকথা গড়ে উঠেছে। মূলত আদিম সমাজ জীবনে বিশ্বপ্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে কৌতূহল ও বিস্ময় নিবারণের জন্য ভয় ও আনন্দ মিশ্রিত অলৌকিক কাহিনী পুরাকথার জন্ম দিয়েছে। মিথ একটি বিশেষ সংস্কৃতি বলয়ের অন্তর্গত মানুষের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও বিশ্বাস। এর মধ্যে তাদের সংস্কারবোধ, বস্তু সম্পর্কিত ধারণা এবং অধ্যাত্মচিন্তার সংহত প্রতিফলন দেখা যায়।

নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও লিওলিথিক যুগে আনুমানিক খ্রী: পূ:৭৬০০-৫৫০০ তে মিথের প্রবর্তন হয়। ধীরে ধীরে খাদ্যসংগ্রহের পর্ব ছাড়িয়ে মানব সভ্যতা যখন পশুপালন ও কৃষিকার্য শুরু

করে। জল, আগুন, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড় বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজাজাতীয় ক্রিয়া থেকে মিথীয় ভাবনা শুরু হয়।

সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত এই মিথ বলে অনেকে মনে করেন। আবার আদিম চিন্তা বা অতিপ্রাকৃত শক্তির ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত এই মিথ। মিথকে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর দাঁড় করিয়ে সমালোচক Lewis Spence বক্তব্য রেখেছেন, তা এখানে তুলে ধরা হল—

> "Myth is a mode of scientific approch in connection with the imaginary explanations of natural phenomenon prior to the emergence of the Science proper."[১]

অনেক সময় এই সমস্ত মিথে আদিপুরুষ প্রপিতামহদের কাহিনীগুলির সঙ্গে কল্পনা মিশে গেছে। ইলিয়ার্ড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল। ক্রমে ক্রমে সেগুলোতে কল্পনার মায়াজাল মিলেমিশে নানা রঙে ভূষিত হয়ে দেবত্বে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, মানব থেকে তারা ক্রমে মহামানব আবার দেবতায় পরিণত হলেন। যেমন রাম, কৃষ্ণ, ইন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তি পূজা পেতে লাগলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, পিতামহ বা আদিম পুরুষের কাহিনী যা আমাদের মজ্জায় মিশে গেছে তাকেই মিথ বলে। এরকম প্রাচীন মাত্রকেই মিথ বলে পোষণ করেছেন। অনেকে আবার বিশ্বভাবনার সঙ্গে যুক্তকে মিথ অভিহিত করেছেন। এই সূত্রে আমরা Joseph Campbell - এর উক্তিটি উল্লেখ করতে পারি—

> "Myth is a large controlling image which give philosophic meaning to the facts of ordinary life, অথবা মিথ হল, symbolic of the spritual norm,"[২]

মিথ সম্পর্কে বহু মতামত থাকলেও সহজ ভাবে বলা যায় মিথ হল প্রাগৈতিহাসিক গল্প, কল্পনার অতিশয়োক্তি নিয়ে গঠিত এবং দেবতার মহিমাজ্ঞাপক এমন এক লোকপুরাণ যা কালক্রমে সার্বজনীনতা লাভ করে।

এবার আসা যাক্ মনসা কথার মিথ প্রসঙ্গে। এই সূত্রে বলা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ ও পশুকুলকে উৎপাদনের কাজে লাগানোর প্রয়াসে যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার, বিশ্লেষণ ও জ্ঞানহীন সাধারণ মানুষ কল্পনা করেছে বিভিন্ন দেবদেবীর। যেমন— মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, দক্ষিণ রায়, কালু রায় ইত্যাদি।

আদিকালে মানুষ সাপ, বাঘ প্রভৃতি জীবজন্তুকে ভয় পেত এবং তাদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান করত নানা রকমের। আবার কোথাও বিভিন্ন জীবজন্তুকে totem' (জীবক) রূপে গ্রহণ করত। যেমন প্রাচীন ভারতে প্রাগার্য নাগজাতি নিজেদের নাগপূজারী ও নাগের বংশধর বলে মনে করত, যা প্রত্নতত্ত্ব বা গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই নাগপূজা উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে ভৌগোলিক অবস্থা ও জলবায়ুর কারণে সর্পের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বিষধর সাপের পরিমাণও কম নয়, আর অনগ্রসর সমাজে সর্পপূজার প্রচলনও কম নয়। এখানে অষ্ট্রিক জাতি অপেক্ষা দ্রাবিড় জাতির কাছে সর্পপূজার জনপ্রিয়তা বেশী। আবার এই পূজা অখণ্ড ভারতে অনার্য সমাজেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকেনি, আর্য জাতিকেও প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন ঋক্‌বেদে, যজুর্বেদে সর্পদেবতার উল্লেখ রয়েছে। ‘অশ্বলায়ন গৃহসূত্রে’র সর্পদেবী পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজে নাগপঞ্চমী বলে খ্যাত।

এই মনসাদেবী অর্বাচীন পুরা-লোকগল্পে পাওয়া, প্রাচীনকালে যা পাওয়া যায় তা হল প্রক্ষিপ্ত অংশ। বলা হয় কশ্যপ ঋষির মন থেকে সৃষ্টি বলে সর্পদেবীর নাম ‘মনসা’। আদিবাসীদের মধ্যেও এই ‘মনসা’ নামটি পরিচিত। ওরাওঁ, কুর্মি, হো প্রভৃতিরা মনসামন্দিরে মুরগি বলি দিয়ে থাকে। পূর্ব পাঞ্জাব, হরিদ্বার, দক্ষিণ ভারতে সর্পদেবীর মনসা মন্দিরে পূজা হয়।

প্রাচীনকালে মনসা দেবীর যে মূর্তি পাওয়া যায় তা দশম-একাদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। এই সময় থেকেই সর্পের দেবীর পূজা আরম্ভ হয়। অপৌরাণিক যে পরমেশ্বরী মনসাদেবীর পঞ্চদশ শতাব্দীতে লোকসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ হলেও ঋক্‌বেদের সময়ে ‘ময়ূরী’ সমষ্টিদেবতায়, পরে অপ্সরা, আরো পরে ‘বিষহরি’ নামে খ্যাত হয়েছিল। ঋক্‌বেদের যে পতিহীন অথবা পতির অর্ধাঙ্গিনী পরমেশ্বরী দেবী, সে জলদেবী ‘গৌরী’ ও ‘নামহারা’ এই দুই মুর্তিতে প্রকট। এদের মিলিত রূপ হল মনসা।

বৌদ্ধ মহাযান মতে ‘মহামায়ূরী’ দেবী বিষনাশনের, আরোগ্যের এবং বিদ্যার দেবতা। তাদের মতে, আরও একটি বিষহরি দেবী আছেন, তাকে ‘জাঙ্গুলী তারা’ নামে অবহিত করেছেন। ‘বৌদ্ধ সাধনমালা’র এই জাঙ্গুলী পরে মনসাতে পরিবর্তিত হয়েছে। মহাযান তন্ত্রে যে একশতটি দেবীর চিত্র, তা পরে মনসার মূর্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই জাঙ্গুলী পরে মনসার সঙ্গে মিলে যায়, তাই তার নাম হল জাঙ্গুলি। বাংলাদেশের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার যে বিভিন্ন নাম— পদ্মাবতী, কেতকা, বিষহরি, জরৎকার প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে জাঙ্গুলি নামও পাওয়া যায়—

"জাগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।"[৩]

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সর্পপূজা প্রচলিত ছিল। মিশরেও সর্পপূজা সুপ্রাচীন। প্রায় ছ'হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরে রাজকীয় শিরস্ত্রাণ সর্পলাঞ্ছিত। ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী প্রাচীন তুরাণী জাতির মধ্যেই নাকি প্রথম সর্পপূজা উদ্ভুত হয়। এই জাতির একটি শাখা ভারতে এসে দ্রাবিড় নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির দ্বারা যে সর্পদেবী পূজিত হন তাঁর নাম 'মনচা অম্মা' বা 'মঞ্চাম্মা'। এই শব্দ থেকেই 'মনসা' নামের উৎপত্তি ঘটেছে। এঁর জন্মরহস্য জানতে গেলে অনেকে বলেছেন— শিবের মানস কন্যা। তাই অনেকে মনে করেন এই জন্যই দেবীর নাম হয়েছে মনসা।

পাল আমলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণের ফলে বৌদ্ধ ধর্মের গৌরব নষ্ট হল। বৌদ্ধরা আত্মগোপন করে তাদের নিজস্ব আচার-আচরণ নিয়ে। দীর্ঘদিন ব্যাপী মহাযান বৌদ্ধধর্ম যে রাজানুগ্রহ লাভ করে আসছিল এবং লোকায়ত সংস্কারের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছিল তার অবসান ঘটে। এর প্রমাণ নিহিত আছে বৌদ্ধতান্ত্রিক সর্পদেবী জাঙ্গুলীর নতুন রূপের মধ্যে। জাঙ্গুলী পরিণত হল মনসায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর 'মনসাবিজয়' গ্রন্থেও জাঙ্গুলী ও মনসাকে চিত্রিত করা হয়েছে অভিন্নভাবে। সেন আমলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের গতি অপ্রতিহত। সেখানে বাংলার লোকায়ত সংস্কারের বেশ কিছু দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আনুকূল্য লাভ করেছিল উচ্চবর্ণের স্বীকৃতি। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—

> "সেন রাজাদিগের আনুকূল্যে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ভাস্কর্যের পুনরুত্থান হইলে স্থানীয় নানা লৌকিক দেবদেবীও পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করিয়া অভিজাতদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবার প্রয়াস পান। সেই জন্যই সেই যুগের বাংলার হিন্দু ভাস্কর্যের পূর্ব পরিচিত বহু নতুন দেবদেবী রূপ লাভ করেন। মনসা তাহাদের অন্যতম।"[৪]

অর্থাৎ সংস্কৃতি সমন্বয়ের আবহাওয়া বাংলাদেশের ছিলই, ফলত পরিবর্তনও ঘটেছিল খুব দ্রুত গতিতে। বাংলার আদিম লোকায়ত জনের উপাস্য সাপের দেবী পাল আমলের জাঙ্গুলী হিসাবে গৃহীত ও পূজিত হয় বৌদ্ধসাধনতন্ত্রে। এই দেবীই বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবক্ষয়ের পর্বে স্বরূপে স্বীকৃত হয় পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রে। 'মনসা' লৌকিক দেবীরই সংস্কৃত নাম। যে ভাবধারা ও পরিবেশে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পাশে লৌকিক দেবীর স্থান, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই লৌকিক দেব-দেবীও ব্রাহ্মণ্য ধর্মতন্ত্রে গৃহীত হয়। তাই এর মূলরূপটি লোকায়ত মানসলোকেই প্রোথিত।

সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে কৌম সংগঠনগুলির মধ্যে বৈদ্য বা ওঝা শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যারা একপ্রকার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে বশীভূত করত সাপকে। সঙ্গত কারণে সমাজেও এরা বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিল। ফলে, ক্রমেই এইসব ব্যক্তিরা সর্পবিদ্যা পুরোহিত বলে গণ্য হত কৌম সংগঠনগুলিতে।

বাংলাদেশের আবহাওয়া, জলবায়ুও মৃত্তিকা সাপের জন্ম ও বুদ্ধির পক্ষে অনুকূল। ফলে এখানে সাপকে আবিষ্কার করতে হয়নি, জীবনযাত্রার প্রতি মুহূর্তে এর সাক্ষাৎ পেয়েছে মানুষ। ভৌগোলিক পরিমণ্ডল এবং সর্পভীতি সৃষ্টি করেছে। এ সম্পর্কে সমালোচক শ্রী তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর সম্পাদিত 'সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ' বইটির ভূমিকা অংশে উল্লেখ করেছেন—

> ''এই উর্ব্বর কৃষিপ্রধান দেশের সীমান্ত দক্ষিণ ভিন্ন অন্য তিন দিক পাহাড়-পর্ব্বত, মালভূমি ও অরণ্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালার নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহা যে সব হিংস্র জীবজন্তুর বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে সেই সকল জীবজন্তুর মধ্যে সর্প অন্যতম। সর্পের অতর্কিতে দংশন ও ভীষণতম হিংস্রতা হেতু গৃহস্থের বিপদ সর্বাধিক এবং সর্প তাহার পক্ষে পরমভীতির কারণ। বাঙালীর পল্লীগৃহস্থের নিদারুণ সর্পভীতির ফলে সর্পের একটি দেবী পরিকল্পিত হইয়া তিনি বাঙলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? এইরূপে এইদেশে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নামেও ছড়া রচিত হইয়াছিল।''[৫]

পৃথিবী আদিকাল থেকে মাতৃরূপে পূজিত হয়ে আসছে। আর এই মৃত্তিকাতেই বসবাস সর্পের, তাই মাটির সন্তান। শস্যোৎপাদিনী এই ধারিত্রী মাতার সন্তানকে তাই প্রজনন শক্তির প্রতীক, উর্বরতা শক্তির প্রতীক বলে ধরা হয়। দাক্ষিণাত্যের বিদর অঞ্চলে বিয়ের সময়-সাপের পূজা-আচার এবং বাংলাদেশের বীরভূমের শঙ্খ বণিকের 'গাছবেড়া' নামে মনসা দেবীকে পূজা করার কারণ হিসাবেও উল্লেখ করা হয় সাপের অত্যাশ্চর্য প্রজনন ক্ষমতাকেই।

সাপের পূজা সংক্রান্ত আলোচনায় পণ্ডিত মহলে এসেছে এই উর্বরতাবাদের কথা। পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে সাপের পূজা প্রচলিত লিঙ্গের প্রতীক হিসাবেও। এ প্রসঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য—

> ''সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির

> পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব; এ তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোন না কোন রূপে সর্প পূজার প্রচলন ছিলই। বাংলাদেশের যে সব মনসাদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রীড়াসীন, একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক।"[৬]

সাপ মূলত পুং জনন ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। তবে শক্তিদেবীর সঙ্গে এর সমন্বয় ঘটেছে বাংলাদেশে। বিভিন্ন আদিবাসী ও সভ্য সমাজ থেকে আহৃত লোককথা ও লোকাচার ভিত্তিক উপাত্য (data) বিশ্লেষণ করে উর্বরতাবাদ সম্পর্কিত আলোচ্যে সাপকে পুংজনন ইন্দ্রিয়ের প্রতীক বলে জানিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরাও। মনোবিদ্ এইচ.ক্রিকটন মিলারের কথায় নিম্নোক্ত উক্তিটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক—

> " Male sexual symbols 'less easy to understand include fishes and above all the famous symbol, the serpent."[৭]

এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন যে— বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক। কারণ উভয়ই উর্বরাশক্তির প্রতীক। দাক্ষিণাত্যে অশ্ব বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। সেই জন্যই অশ্বথ বৃক্ষের নীচে মাটি বা পাথরের নাগমূর্তি উপহার দেওয়া হয়। অপুত্রক বা বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনা করে অশ্বথতলে নাগমূর্তি উপহার দেয়। অথবা নাগপূজা করে ১০৮ বার সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এর মাধ্যমে বৃক্ষ ও সর্পের সঙ্গে উর্বরতাবাদ বা fertility cult-এর সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। মনে হয়, জীবিত সর্পের পূজক কোন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে কালক্রমে বৃক্ষ মধ্যে সর্পোপাসক বা বৃক্ষোপাসক কোন জাতির সংস্কৃতি একসাথে মিশে গিয়েছিল। সেই জন্য এক সময়ে বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন ভারতের সর্বত্র দেখা গিয়েছিল। মনে হয়, সেই সময়ই বাংলাদেশে উক্ত বৃক্ষোপাসক জাতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে এদেশেও বিশেষ এক শ্রেণীর বৃক্ষের মধ্যেই সর্পের পূজা করার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই বৃক্ষের নাম মনসা বৃক্ষ। একে সংস্কৃতে স্নূহী বৃক্ষ বলা হয়ে থাকে।

এই স্নূহী বৃক্ষের বিষ প্রতিষেধক গুণ-আছে বলে আদিম সমাজে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। আবার পৃথিবীর অনেক কিছুকেই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারত না আদিম মানুষ। তাই নিজেদের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিজের মতো করে কল্পনা করত। বৃষ্টির প্রতীক হিসাবে সাপকে পূজা করতে থাকে, এই অভিপ্রায়ে যে বৃষ্টি উর্বরতা জাগায়। তাই বৃষ্টির প্রতীক হিসাবে উর্বরতার

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাপও।

ভারতীয় সংস্কারে যেভাবেই সাপের পূজা অঙ্গীভূত হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে আদিম ভারতীয় কৌমদের ভিতরের ভয় ও বিস্ময়ের দ্যোতনার মধ্য থেকে এর সৃষ্টি। কোথাও টোটেম আকারে আবার কোথাও তা প্রচলিত পশুপূজা হিসাবে। পরবর্তীকালে সর্পকুলের মধ্যে অক্ষতিকারক সাপের সন্ধানও মেলে। যারা ঘুরে বেড়াত বাস্তুভিটার আশেপাশে। তাদের অনেক সময়ই পূর্বপুরুষদের সর্পশরীর রূপে কল্পনা করা হত। মঙ্গলার্থে এরা সন্তান সন্ততিদের বাড়ি পাহারা দিত বলে ভাবা হত।

একদিকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে, অন্যদিকে উপকৃত হওয়ার আশায় তুষ্ট রাখতে পূজনীয় হয়ে ওঠে দেবী মনসা। এই সমস্ত পূজা প্রাচীন বাংলায় অনার্য জনগোষ্ঠী দ্বারা পূজিত; গ্রাম্য পূজা। যখন বৌদ্ধরা ‘যান’ তন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মের প্রসারে নেমেছিল, তখনই আচারতন্ত্র সমেত গ্রহণ করেছিল অনেক লৌকিক দেবীকেও। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হলেও সংস্কৃতি সমন্বয়ের সময় অস্বীকার করতে পারেনি, বৃহত্তর লোকায়ত ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণকে। তাই শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডালিনী, শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

বর্তমান ভারতে সর্পপূজার প্রধান তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়—

১. নাগরাজ বাসুকি ও তাঁর সরীসৃপ মূর্তির পূজা বিশেষভাবে উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত।

২. দক্ষিণ ভারতে জীবন্ত সর্পপূজার আদর্শই প্রবল।

৩. বাংলাদেশে সর্পপূজার কেন্দ্রে আছে নারী-রূপী সর্পদেবী জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, মনসা ইত্যাদি নামে এর পরিচয়।

অবশ্য বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই সর্প প্রতীক পূজার রীতিও প্রচলিত। এই প্রতীক হিসাবে কখনো ‘মনসার ঘটে’ অঙ্কিত নানা আকৃতির সর্পফণা, কখনো বা ফণিমনসা সিজ গাছের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পূজনীয়া দেবতা হচ্ছেন দেবীমনসা। সর্পদেবতারূপে এই মাতৃকা-মূর্তির পরিকল্পনা বাংলার সর্পপূজার বৈশিষ্ট্য।

দেবী মনসাকে অনেক সময় সিজবৃক্ষে, ঘটের প্রতিকৃতি বা সাপের প্রতিকৃতিতেও পূজা করা হয়। হাম বা বসন্তের হাত থেকে রক্ষা পেতে গ্রামে-গঞ্জে সর্পদেবী মনসার পূজা হয়ে থাকে। কোন পূজায় সাপের দ্বারা আচ্ছন্ন এই দেবী, কোন জায়গায় সাপ বা পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। মাথায়

সাতটি কোবরা সাপের মূর্তিও পাওয়া যায়, আবার সন্তান আস্তিককে কোলেও মনসাদেবীকে পদ্মাসীন দেখা যায়। উত্তরপূর্ব ভারতে 'হাজং' সম্প্রদায়ের লোকেরা কানী দেবী বা অন্ধদেবী বলে প্রতিপন্ন করে কারণ সৎমা চণ্ডীর দ্বারা তার এক চক্ষু কানা হয়ে গিয়েছিল। বাংলা মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগরকেও 'চ্যাংমুড়ি কানী' বলে সম্বোধন করতে শোনা যায়।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজে অন্যতম পূজা হল বিষহরি বা পদ্মাবতী। কৃষিজীবী প্রায় প্রত্যেক পরিবারে মনসার থান পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গেও (বর্তমান বাংলাদেশ) মনসার পূজা বৃহত্তর আকারে দেখি। বাংলায় অনেক বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও মনসার পূজা হয়ে থাকে। আসামে ওঝাপালি (Oja-pali -- Musical folk theatre) সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের মিথের উপর নির্ভর করে মনসাপূজা করে। মনসার পূজা অনেকসময় নাগ পঞ্চমীর দিন শ্রাবণ মাসে (July-August) হয়ে থাকে। সেই দিন বাংলার অনেক নারী ব্রত রেখে সাপের লেজে দুধ ঢেলে পূজা করে। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীই যে বাংলাদেশে প্রচিলত মনসার মাহাত্মসূচক একমাত্র কাহিনী, তা নয়। মেয়েলি ব্রতকথায় মনসার মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া স্বতন্ত্র এক কাহিনী রচিত হইয়াছিল। মনসার ব্রত উদ্‌যাপন করে মেয়েরা এই ব্রতকথা বলে থাকে।

মনসা-কথার মিথ আমরা মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্যে সুন্দরভাবে পেয়ে থাকি। মহাভারতে বাসুকি কর্তৃক ভগিনী মনসার মুনি জরৎকারুর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া, সন্তান আস্তিক কর্তৃক ঝুলন্ত ব্যক্তিদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং রাজা জনমেজয়ের হাত থেকে নাগ সম্প্রদায়কে রক্ষা করা। পুরাণে আবার মনসার পিতা শিবের জায়গায় ঋষি-কশ্যপকে পাই। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় বিশেষ শক্তির অধিকারী হয় মনসা। মনসামঙ্গলের প্রথমাংশে আমরা দেখি মনসার জন্মকাহিনী, পিতৃগৃহে গমন, সৎ মা দেবী চণ্ডী কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়া, মনসার বিবাহ, চণ্ডীর ছলনায় সর্পসজ্জিত মনসাকে দেখে জরৎকারুর পলায়ন, শিব কর্তৃক মনসাকে বনে রেখে আসা, নেতার সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনার পরে মনসার সভ্য সমাজে পূজা পাওয়ার প্রচেষ্টা, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, পরিশেষে বেহুলার দ্বারা পূজা পাওয়া, চাঁদের নমনীয় ভাব প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে সুন্দরভাবে পেয়ে থাকি।

পরিশেষে বলা যায় সর্পদেবী মনসার পূজা শুধুমাত্র বাংলা, আসাম ও বিহারের কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এই পূজা গোটা ভারতবর্ষের লোকসমাজে পূজনীয়। মনসাদেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা দৃষ্টি ভঙ্গি আমরা আলোচনা করে দেখলাম, দেবী মনসার পূজা বাংলাতে সাধারণ লোকসমাজে হতে হতে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এই লৌকিক দেবী ক্রমে সাধারণ সমাজ থেকে বৃহত্তর সমাজেও

পরিচিতি লাভ করে এবং দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে বহু গালগল্প তৈরী হয়েছে। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলে দেবীর মাহাত্মজ্ঞাপক এই গালগল্পগুলি অলৌকিক হলেও জীবন্তভাবে আমাদের সামনে উঠে এসেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Spence, Lewis : An Introduction to Mythology (London, George G Harrap and Co.Ltd. first published 1921. the reverside press ltd Edinburge, Great Britain, p-128

২. Campbell, Joseph, Masks of God, Primitive Mythology, Viking press, N. York, 1959, p-136.

৩. Vipradasa's Manasa-Vijaya, Sukumar Sen, The Asiatic Society, 1, Park Street, Calcutta, P-xxxiv

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা: লি:, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, পৃ. ২২৭

৫. 'সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ', শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলেজ স্ট্রিট, প্রথম মুদ্রণ-১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ: ২০১১, পৃ. ভূমিকা অংশের ii.

৬. 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ. ৪৮৯

৭. H.Chrichton Miller: Psycho-Analysis and its Derivatives', London Oxford University Press, Second edition-1945, p-164.

*****